দেশে সাইবার ফোর্স গঠন করা হোক

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজকোষ হ্যাকিং দুর্ঘটনায় দেশের সাইবার আকাশের নিরাপত্তা নিয়ে সব মহলে আলোচনার ঝড় বইতে শুরু করে। সেই সাথে দেশের জন্য একটি নিজস্ব 'সাইবার ফোর্স' গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করছেন অনেকেই।

বাংলাদেশের বর্তমান সাইবার নিরাপত্তা অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে উন্নত দেশগুলো থেকে সাইবার নিরাপত্তার দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কাও এ ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেখানে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্সও চালু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হ্যাকিংয়ের ঘটনার পরও আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকেরা এখনো এ বিষয়টিকে তেমন কিছু আমলে নেয়নি বলা যায়। বাংলাদেশে সাইবার সিকিউরিটির মার্কেট এখনও গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্ঘটনার পর মানুষের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজকোষ হ্যাকিং দুর্ঘটনা দেশের সাইবার আকাশে নিরাপত্তার জন্য একটি 'সাইবার ফোর্স' গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করছেন এ দেশের সচেতন জনগণ। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আমাদের নিজস্ব কোনো সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ নেই। উচ্চ বেতন পরিশোধ করে আমরা বিদেশি সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ দিয়ে কাজ করে আসছি বরাবর। অথচ আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ থাকলে দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের কাজে লাগাতে পারত। এর ফলে দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হতো।

সরকারকে এখনই সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে শিক্ষা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নেয়ার উচিত। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির পাশাপাশি বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র সাইবার বাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি সাইবার নীতিমালা ও আইন তৈরি করা উচিত। আর সাইবার নীতিমালা ও আইন তৈরির ক্ষেত্রে দুরদর্শিতার পরিচয় দেয়া দরকার। নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তায় ডিজিটাল আইডির পাশাপাশি সিস্টেম ও রেকর্ড নোটিফিকেশন বা সোর্স ব্যবস্থা চালু করা দরকার। অর্থাৎ কেউ যেন বিনা অনুমতিতে কারও ব্যক্তিগত তথ্য (পিআইআই) ব্যবহার করতে না পারে, তা গেজেট আকারে প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সাইবার নিরাপত্তায় বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারকে এখনই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে কেননা বর্তমানে শুধু ব্যাংক-বীমা বা আর্থিক খাত নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে এবং আগামীতে তা আরো বাড়বে। ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে অনেক গোপনীয় তথ্য বিনিময় হচ্ছে। বর্তমান সময়ে শুধু তথ্য দিয়েই একটি দেশকে অচল করে দেয়া যায়। তাই তথ্য নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেননা, দেশের নির্দিষ্ট সীমানা থাকলেও সাইবার আকাশের কিন্তু কোনো সীমানা নেই। তাই এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

অনেকেই মনে করেন, সাইবার বিশেষজ্ঞ হতে হলে গণিত ও পদার্থবিদ্যা জানার দরকার। কিন্তু এ ধারণা পুরোপুরি সত্য না। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এমন মডিউল তৈরি করা দরকার যা শিক্ষার্থীদেরকে হাতে-কলমে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দিতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা নিজেকে যাচাই করতে অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেশন অর্জন করতে পারবেন। বিশ্বে বর্তমানে এই পেশায় ব্যাপক চাহিদাটায় আমরা সহজেই প্রবেশ করতে পারি। এই পেশায় রিফ্রেশারদের বেতনও ভালো। মাসে দুই-আড়াই লাখ টাকার কম নয়।

রক্ষাকবচ গ্রহণের মাধ্যমে সাইবার জগতে নিরাপদ থাকা যায়। এ জন্য প্রয়োজন সাইবার হুমকি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান। ব্যক্তির সচেতনতাই তাকে সাইবার জগতে নিরাপদ রাখবে। এ জন্য অনলাইনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও গোপনীয় তথ্য প্রকাশ না করা প্রধান রক্ষাকবচ। ব্যক্তিগত তথ্যের মধ্যে তার জন্ম সাল, বাবা-মায়ের নাম, পারিবারিক সম্পর্ক, ঠিকানা সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন মাধ্যমে শেয়ার করা উচিত নয়। অ্যাকাউন্টগুলোর পাসওয়ার্ডের নিরাপত্তায় সম্ভব জটিল ক্যারেক্টার-অ্যালফাবেট ব্যবহার করা উচিত। ব্যক্তিগত তথ্য আছে এমন কাগজ কাউকে দেয়া হলে তা কাজ শেষে নিজ দায়িত্বে নষ্ট করে ফেলা উচিত। মূলত নিয়ত পরিবর্তিত সাইবার জগতে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ থাকা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।।

দেশের সাইবার নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলাতে সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক কোর্স চালু করা দরকার যেগুলো হবে আন্তর্জাতিক মানের। আমাদের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মতো বাংলাদেশ থেকেও সাইবার নিরাপত্তা রক্ষক আহ্বান করবে জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংস্থাগুলো। বাংলাদেশ একদিন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ রফতানি করতে সক্ষম হবো আমরা।

কামরুজ্জামান মনির
ব্যাংক কলোনি, সাভার

ই-বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আলাদা আইন চাই

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট পণ্যগুলো সম্ভবত সবচেয়ে কম স্থায়িত্বের। এর প্রধান কারণ আমাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট পণ্যগুলো খুব দ্রুত উন্নত থেকে উন্নতর হওয়া। আর নতুনের প্রতি আমাদের সহজাত আকর্ষণ। তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট নতুন পণ্য আর্বিভাবের সাথে সাথে পুরান পণগুলো ই-বর্জ্যে পরিণত হয় যা আরেকটি নতুন সমস্যা। ই-বর্জ্যের বিষয়টি বাংলাদেশে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি হয়ে উঠেছে। ফেলে দেয়া পুরনো টেলিভিশন, রেডিও, ভিসিআর, কমপিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনসহ বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ও বাতিল হওয়া হাজারো ইলেকট্রনিক পণ্য মিলে যে ই-বর্জ্য তৈরি করছে তা আমাদের মানবজীবনের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি। এ ক্ষেত্রে এখনই সতর্ক ব্যবস্থা না নিলে এ জন্য আমাদের চড়া মূল্য দিতে হবে।

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ প্রকাশিত ই-বর্জ্য মানচিত্রে দেখা যায়, ২০১২ সালে বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৭০ হাজার টন। এই বর্জ্যের মাত্র ৩০ শতাংশ রিসাইকেল করে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। বাকি ৭০ শতাংশ ই-বর্জ্যই যেখানে-সেখানে ভেঙেচুরে ফেলে দেয়া হয়। এসব পণ্যের মাঝে থাকে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রেজিন, ফাইবার গ্লাস, প্লাস্টিক, সীসা, টিন, সিলিকন, কার্বন ও লোহার উপাদান। অল্প পরিমাণে হলেও থাকে ক্যাডমিয়াম ও পারদ একথালিয়াম। শুধু তাই নয়, এসব পণ্যে মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, নাইট্রাস অক্সাইড, বেরিলিয়ামসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। এসব পণ্য ক্রনিক ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, লিভার ও কিডনি সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড হরমোন সমস্যা, নবজাতকের বিকলাঙ্গতা, প্রতিবন্ধিতা, মস্তিষ্ক ও রক্তনালীর বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত।

সবচেয়ে আশঙ্কার ব্যাপার হলো– এসব ই-বর্জ্য ধ্বংস, রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবস্থাপনার জন্য দেশে কোনো পরিকাঠামো নেই। নেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সচেতনতা। এসব রোধে নেই কোনো কার্যকর আইন। অথচ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালেও রয়েছে ই-বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আলাদা আইন। জরুরি ভিত্তিতে আমাদের দেশে প্রণয়ন করা দরকার ই-বর্জ্য সংক্রান্ত একটি আলাদা আইন অথবা সাধারণ বর্জ্যের জন্য প্রণীত আইনটি আরও যুগোপযোগী করা দরকার। সময়ের সাথে দেশে ই-পণ্য ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাড়বে ই-বর্জ্যের পরিমাণও।

দেশে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ই-বর্জ্যের পরিমাণ, সেই সাথে বাড়ছে ই-বর্জ্যসংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিও। তাই অবিলম্বে প্রয়োজন ই-বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে নানামুখী পদক্ষেপ। এ জন্য প্রয়োজন আলাদা আইন প্রণয়ন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ই-বর্জ্য রাখার জন্য কয়েকটি বিশেষ ভাগাড় দরকার। একই সাথে প্রয়োজন ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং করার আধুনিক ব্যবস্থা। রিসাইক্লিং করার অনুপযোগী ই-বর্জ্য এমনভাবে ভাগাড়ে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে তা মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। সাধারণ মানুষের মাঝে ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে এ ব্যাপারে তাদেরকে সচেতন করতে হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি সেবা সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকাটি পালন করতে হবে সরকারকেই। সরকারকে এ জন্য হাতে নিতে হবে আলাদা কর্মসূচি। সব কথার শেষ কথা হচ্ছে, ই-বর্জ্য সম্পর্কে আমাদের জরুরি ভিত্তিতে ভাবতে হবে। নিতে হবে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ।

আবদুর রহমান
শুক্রাবাদ, ঢাকা